ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY: HISTORY

আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি : ইতিহাস

SUMAIYA AHMED*

ড. সুমাইয়া আহমেদ*

ABSTRACT

The cataclysm of 1857 was a landmark in the history of modern India which witnesses the fall of the Mughals and the consolidation of the British rule in India. With this it was getting aware of the new ideas of the west and adjusting itself with these new trends. Hindus had taken to the English education warmly but the Muslims resisted the British. They did not embrace western education. Thus they have left far behind the other communities with making the most of the opportunities offered to Indians to by the British. They used the Government schools, cooperated with the Government and received patronage in return. As the Muslims did not avail the facilities provided by the Government, this badly told upon their economy and also accelerated the pace of their social degeneration. Sir Syed was an eye witness to all that had happened during the awful days and his condition was like that of a man a portion of whose house had burnt and who was busy saving the rest of it. This had grayed his hair and made him old pre-maturely. At this critical juncture Sir Syed appeared on the horizon, appealed to his people to cooperate with the Government and make the best use of the English intuitions. Sir Syed with the help of his distinguished colleagues started the Mohammadan Anglo-Oriental College in 1877 at Aligarh Muslim University in 1920. The history of this period is the intellectual history of the Aligarh Muslim University which ushered in a renaissance and which had changed the course of Muslim Community. Aligarh Muslim University produced brilliant students, prose writers and poets, public men and fulfilled the aspirations of its founder. The way Aligarh participates in the various walks of national life will determine the place of Muslims in India's national life. The way India conducts itself towards Aligarh will determine largely that form which our national life will acquire new a life. This article attempt to highlight that a proper education was the only foundation for broadening human welfare. Only this could extricate Muslims from their backward nature and set them on the path to modernity. Sir Syed aspired to create a system of education that would long be suitable and practicable not only for the present age but also for all the Muslims of the future. His clarity of vision can be seen in the University running under his dream project, Aligarh Muslim University, proves the power of his conception, despite the obvious challenges of the time in which he lived. And it could be of real use to Muslims in the future.

Keywords: Aligarh Muslim University, Islamic education, higher education in Islam, Syed Ahmad Khan

* Assistant Professor, Dept of Islamic Studies, Alia University, Kolkata, India sumi.ahmad21@gmail.com

সারসংক্ষেপ

১৮৫৭ সালের বিপর্যয়ের সাক্ষী ছিল মোঘল সাম্রাজ্যের পতন এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উত্থান যারফলে একটি নতুন পাশ্চাত্য ধারণার উৎপত্তি হয়। ভারতীয়রা বিশেষ করে হিন্দুরা এই ধারার সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে এগিয়ে যাবার প্রয়াস চালায়। হিন্দুরা ব্রিটিশদের ইংরেজি শিক্ষাকে গ্রহন করেছিল কিন্তু মুসলিমরা ব্রিটিশদের এ শিক্ষাকে বর্জন করে। স্বাভাবিকভাবেই, সারাদেশের মুসলিম জনতা প্রথম থেকে ইংরেজ শাসনকে বিদ্বেষ ও সন্দেহের চোখে দেখত। ইংরেজ সৃষ্ট দারুল-হারব পরিচালিত ভাষা-সংস্কৃতি শিক্ষাব্যবস্থা সবকিছু গ্রহণেই অনীহ হয়ে পড়েছিল তাঁরা। বিশেষ করে ইংরেজি শিক্ষায় অনাগ্রহের ফলস্বরূপ অনিবার্যভাবে ইংরেজ প্রশাসনেও অন্যান্য স্বাধীন পেশায় তাঁদের যোগদানের পথ হয়েছিল রুদ্ধ। উত্তর ভারতে সৈয়দ আহমদ খান প্রথম অনুধাবন করেন যে, মুসলিমদের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পথে সবচেয়ে বড় বাধা পাশ্চাত্য শিক্ষায় তাদের অনাগ্রহ। যুগের দাবি মেনে ইংরেজি শিক্ষায় মুসলিমদের পারদর্শী হতেই হবে, না হলে তাদের হিন্দু ভাইদের তুলনায় 'বিদ্যা ও পেশার' দিক দিয়ে চিরকালই তারা পিছিয়ে থাকবে-এই সত্য বুঝতে পেরে আহমদ খানের চেষ্টাতেই গড়ে উঠেছিল Muhammadan Anglo Oriental College, ১৮৭৭, মুসলিমদের জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে। সেই প্রতিষ্ঠানটিই আজ পরিণত হয়েছে দেশের গর্বের অন্যতম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 'Aligarh Muslim University'। মুসলিম সমাজের শিক্ষাসমস্যা বিংশ শতকের শুরুতেই একটা অন্য স্তরে প্রবেশ করেছিল। আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি-এর জন্ম দিয়েছে বিজ্ঞ ছাত্র, লেখক এবং কবি যারা জনসাধারণের ও স্যার সৈয়দ আহমদ খান-এর আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করেছে। এভাবে ভারতের মুসলিম সমাজ সীমিতভাবে হলেও পূর্বের বিরাগ ভুলে পাশ্চাত্য শিক্ষা সংস্পর্শে আসতে সমর্থ হয়েছিল এবং আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি ভারতীয় মুসলিমদের জাতীয় জীবনে এক নতুন পথের দিশা দেখাতে সামর্থ হয়। স্যার সৈয়দ আহমদ খান, আকাঙ্খিত ছিলেন এমন একটা ব্যবস্থার যেটা শুধু বর্তমানে নয়, ভবিষ্যতে সকল মুসলিমদের জন্য উপযুক্ত হবে যা- আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির মধ্যেদিয়ে আমরা দেখতে পাই।

মূলশব্দ: ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে, পাশ্চাত্যশিক্ষা, মুসলিম সমাজ, সৈয়দ আহমদ খান, আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি।

১. ভূমিকা

রায়দুর্লভ, জগৎশেট, মানিকচাঁদ, শওকত সিং, উমিচাঁদ, প্রমুখের বিশ্বাসঘাতকতায় ১৭৫৭ খৃস্টাব্দের ২৩ শে জুন অনুষ্ঠিত পলাশীর যুদ্ধের ফলাফল ভারতে প্রায় হাজার বছরের মুসলিম শাসনের পতন ডেকে আনে। ইতোমধ্যে ইংরেজরা বক্সারের যুদ্ধসহ অনেক খণ্ড খণ্ড প্রতিরোধে স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারে ব্রতী অথচ বিশৃংখল মুসলিম শক্তিকে পরাজিত করেছে এবং বেসামরিক কৃতিত্ব করায়ত্ত করে নিয়েছে। মুসলমানদের পক্ষ থেকে প্রচেষ্টা তারপরও অব্যাহত থাকে। ১৭৭৯ খ্রিস্টাব্দে হায়দার আলী চেষ্টা-প্রচেষ্টা, ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর সুযোগ্য পুত্র টিপু সুলতানের প্রচেষ্টা এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ইংরেজদের কুটকৌশল এবং হিন্দু ও শিখ বেনিয়াদের বিশ্বাসঘাতকতায় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম চতুর্থাংশের মধ্যেই সমগ্র ভারত ইংরেজদের অধীনস্থ হয়। ১৮৫৬খ্রিষ্টাব্দের মধ্যেই তাদের সাম্রাজ্য বিস্তার পরিপূর্ণতা লাভ করে। কিন্তু বিদ্রোহের

দাবানল তখনও চাপা পড়ে যায়নি। বিশেষ করে মুসলমানরা যে এদেশে শাসনকর্তা ছিল এমন একটা আত্মবোধ তাদের থেকে যায়। হাজার বছরে গড়ে তোলা নিজস্ব ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক চেতনা তাদের মধ্যে সুপ্ত রুপে হলেও টিকে থাকে। ফলশ্রুতিতে, প্রথম থেকেই মুসলমানরা ইংরেজদের সাথে অসহযোগিতার নীতি অব্যাহত রাখে। আর তার ব্যাপক প্রকাশ ঘটে আঠারো শতকের শেষে ও উনিশ শতকের প্রথমার্ধে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন এবং ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন "সিপাহী বিদ্রোহের" মাধ্যমে। এ যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ভারতের শাসনভার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে ছিল। কিন্তু আন্দোলন সমূহ সিপাহী বিদ্রোহের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের পয়লা নভেম্বর বৃটেনের রানী ভিক্টোরিয়া এক বিশেষ আইন বলে ভারতের শাসনভার কোম্পানির হাত থেকে নিজের হাতে তুলে নেন। ফলশ্রুতিতে, মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর গঠিত প্রায় ৬০০ করদ বা মিত্র রাজ্যসহ সমগ্র কোম্পানি শাসিত অঞ্চল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে যায়।[1]

এমতাবস্থায় হিন্দুরা ইংরেজদের সমর্থন করতে থাকে। তার বিনিময়ে সকল রকম স্বার্থ আদায়ে তৎপর হয়। এভাবে হিন্দু সমর্থন হিন্দুদের সুযোগ সুবিধার দ্বার খুলে দেয়। অন্যদিকে মুসলিমরা ক্রমাগত পিছিয়ে পড়তে থাকে। মুসলিমরা শুধু পিছিয়ে পড়েনি, উপরন্তু তাদের উপর শুরু হয় নানা রকম নিগ্রহ।[2]

মুসলিম জাতির এই করুন অবস্থা দেখে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর কবিতা কান্ডারী হুশিয়ার লিখেছেন– "ছিঁড়িয়াছে পাল কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মৎ? এ তুফান ভারী, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার।[3]"

এমন এক দুর্যোগ ঘন সংকটকালে তরীর হাল ধরতে এগিয়ে আসেন মহান পুরুষ স্যার সৈয়দ আহমদ খান। প্রখর ধীশক্তি, অটল ব্যক্তিত্ব, দূরদর্শী সমাজ-সংস্কারক, অকুতোভয় সেনানী, ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর মুসলমান বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিকদের 'জ্ঞানের পথিকৃৎ' স্যার সৈয়দ মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করলেন ডুবন্ত-অসহায় মুসলমানদের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারে, কুসংস্কার দূরীকরণে, মানবিক মূল্যবোধ পুনঃ প্রতিষ্ঠায়, সংকটে সহাবস্থানের কৌশল অবলম্বনের দিকনির্দেশনা নিয়ে কাণ্ডারির কঠিন হাতে হাল ধরলেন।

2. গবেষণার উদ্দেশ্য

ঔপনিবেশিক শাসন প্রবর্তনের সাথে সাথে আর্থ-সামাজিক অবনতি ও শিক্ষাগত অনগ্রসর তার দুষ্ট চক্রে মুসলিম সম্প্রদায়ের গলায় ফাঁস হয়ে বসতে লাগলো। এর দ্বারা সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলো মুসলিম সম্প্রদায়ের একটা বড় অংশের শিক্ষাগ্রহণের যোগ্যতা, বিশেষ করে সেই অংশের অর্থনৈতিক দিক থেকে যাদের পায়ের তলার মাটি সরে গিয়েছিল। এরপর আবার

1 . মুকুল চৌধুরী, *''উনিশ শতকের শিক্ষার: মুসলমানদের অবস্থান''*, পৃথিবী (ইসলামী গবেষণা পত্রিকা), ঢাকা, 1988, p. 19.

2 . Ibid.

3 . কাজী নজরুল ইসলাম , সঞ্চিতা, p. 60.

সম্প্রদায়-সম্প্রদায়ের সম্পর্ক অস্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠার ফলে একের পর এক সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব-সংঘাত ঘটে যাওয়ায় মুসলিম সম্প্রদায় হয়ে পড়ে হতাশাগ্রস্ত এবং এদের সামাজিক আশা-আকাঙ্ক্ষাও হয়ে পড়ে সীমিত। কোন সম্প্রদায়ের সামাজিক আশা-আকাঙ্ক্ষা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়লে তাদের শিক্ষাগত ও সামাজিক অগ্রগতি ও ক্ষতিগ্রস্থ হয় সাংঘাতিকভাবে। এই দুষ্টচক্র প্রতিরোধ করার জন্য সম্প্রদায়ের ভেতর থেকে যেমন প্রয়াস দরকার তেমন বাইরে থেকে এমন ধরনের প্রচেষ্টা প্রয়োজন যাতে এই সম্প্রদায়কে জাতীয় স্বার্থ এবং জাতীয় প্রয়োজনে পরিপূরক কাঠামোর উপযোগী করে তোলা যায়।

৩. আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট

স্যার সৈয়দ আহমদ খান তৎকালিন মুগল সাম্রাজ্যের রাজধানী দিল্লীতে ১৮১৭ সালে ১৭ অক্টোবর সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্ব পুরুষ সৌদি আরব হতে এসেছে বলে জানা যায়। মুগল সম্রাট আকবরের শাসনামলে তাঁর পরিবার ভারতে আগমন করেন। তখন হতে মুগল রাজশাসনে তাঁর পরিবারের সদস্যগণ গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। তাঁর নানা খাজা ফরিদুদ্দিন ছিলেন, বাদশাহ আকবরের মন্ত্রী। তাঁর দাদা সৈয়দ হাদী জওয়াদ বিন ইমামুদ্দিন বাদশাহ আলমগীরের সরকারে উচ্চপদে সমাসীন ছিলেন। স্যার সৈয়দ আহমদ খানের পিতা মোহাম্মদ বিন হাদী খান বাদশাহ আকবরের ব্যাক্তিগত বন্ধু ও উপদেষ্টা ছিলেন। তার শৈশব কাটে মুসলিম শাসনামলের অবসানকালে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এবং বৃটিশ শাসন যখন ভারত উপমহাদেশে ক্ষমতা পাকাপোক্ত করছিল, তখন স্যার ষৈয়দ আহমদ খান এবং তাঁর বড় ভাই সৈয়দ মোহাম্মদ বিন মুত্তকী খান বেড়ে উঠছিলেন। তাঁর মা আজিজুন্নেসা কঠোর নিয়ম-শৃংখলার মধ্যে তাঁদেরকে লালন-পালন করেন। তাঁদেরকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য স্যার সৈয়দের বাবা-মা সর্বাত্নক আন্তরিক প্রচেষ্টা চালান। ছোটবেলায় স্যার সৈয়দকে কুরআন শিক্ষা দেয়া হয়। আর ভাল শিক্ষক দিয়ে উর্দু, ফার্সি, আরবী ভাষা এবং ধর্মীয় বিষয়গুলো তাঁকে পড়ানো হয়েছিল। স্যার সৈয়দ শাহাবী, রুমী ও গালিবসহ বিখ্যাত সব মুসলিম পন্ডিতদের কবিতা ও রচনাবলী অধ্যয়ন করেন। পাশাপাশি, তাঁকে গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা এবং ইসলামী আইনশাস্ত্র বিষয়েও শিক্ষা দেয়া হয়। তাছাড়া, স্যার সৈয়দ শারিরীক কসরত, শরীরচর্চা, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডেও অংশগ্রহণ করতেন এবং তিনি এসব কাজে চৌকস ছিলেন। স্যার সৈয়দ আহমদ চিকিৎসা বিজ্ঞানে পড়াশোনা করার জন্য ভর্তি হলেও, অর্থনৈতিক সংকটের কারণে তা সম্পন্ন করতে পারেননি। ১৮৩৮ সালে তাঁর পিতার পরলোক গমনের পূর্ব পর্যন্ত তিনি স্বচ্ছল মুসলিম পরিবারের সন্তান হিসেবে বিশেষ আভিজাত্য নিয়ে কাটান। তাঁর আনুষ্ঠানিক পড়াশোনা বন্ধ হয়ে গেলেও তিনি বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাক্তিগতভাবে অধ্যয়ন ও চর্চা অব্যাহত রেখেছিলেন। পরে তাঁর বড় ভাইয়ের সাথে পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে কাজ করতে আরম্ভ করেন। এ সময় তিনি মুগল রাজ দরবারে কাজ করার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।[4]

ধীরে ধীরে মুগল রাজনৈতিক ক্ষমতা চলে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে স্যার সৈয়দ আহমদ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীতে একটি চাকুরিতে প্রবেশ করেন। তিনি বড় কোন পদে চাকুরির সুযোগ পাননি। কারণ সে সব পদ বৃটিশদের জন্য সীমিত ছিল। তাই তিনি আগ্রার আদালতে সেরেস্তাদার পদে যোগদান করেন। ১৮৪০ সালে তাঁকে মুন্সী পদে পদোন্নতি দেয়া হয়। ১৮৫৮ সালে তাঁকে মুরাদাবাদ আদালতে একটি উচ্চতর পদ দেয়া হয়। এ সময় তিনি তাঁর বিখ্যাত সব সাহিত্য কর্ম শুরু করেন। আদালতে কর্মকালিন সময়ে উপর মহলে সুসম্পর্ক থাকায়, স্যার সৈয়দ আহমদ বৃটিশ ঔপনিবেশিক রাজনীতি সমপর্কে নিবীড় জ্ঞানার্জনের সুযোগ পান। ১৮৫৭ সালের ১০ মে, মুগল শাসনের অবসানকালে স্যার সৈয়দ আহমদ বিজনর আদালতে চীফ এ্যাসেসমেন্ট অফিসার পদে দায়িত্ব পালন করছিলেন। মুগল সেনাবাহিনী এবং বৃটিশ বাহিনীর মধ্যে উত্তর ভারতে তীব্র লড়াই চলছিল। বিপুল সংখ্যক বেসামরিক লোকের মৃত্যু হয়। ক্ষমতার মূলকেন্দ্র; যথা-দিল্লী, আগ্রা, লখনৌ এবং কানপুর মারাত্নকভাবে বিপর্যস্থ হয়। স্যার সৈয়দ আহমদ নিজেও আহত হন। আর দীর্ঘ আট'শ বছরের মুসলিম শাসনের অবসান ঘটে। তিনিও তাঁর সমসাময়িক মুসলমানগণ মুগলদের এ পতনকে মুসলিম সমাজের পরাজয় হিসেবে নেন। এ সময় তাঁর বেশ ক'জন নিকটাত্নীয়-স্বজন মৃত্যুবরণ করেন। আর তাঁর মাকে উদ্ধার করতে পারলেও, ঘটনা পরম্পরায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[5]

১৮৫৭ সালের এই হৃদয় বিদারক ঘটনার পর সমৃদ্ধশালি একটি মুসলিম জনপদ উজাড় হয়ে যায়। যারা শাসক ছিল তারা আজ পথের ফকির। আমির আজ কাঙ্গাল বাদশা গোলাম ও জনসাধারণ পরমুখাপেক্ষীতে পরিণত হয়ে গেছে। দেশের ভাগ্যে এমন করুণ পরিণতি দেখে স্যার সৈয়দ আর স্থির থাকতে পারেনি।[6] তিনি বলেন- "সেই সময়ে আমার এই ধারণাটি ঘটেছিল যদি আমি জাতিকে ধ্বংসবাশেষের মুখে ঢেলে দিয়ে আরামদায়ক জীবন উপভোগ করি এটা হবে এক ভয়ানক এবং অমানবিক ঘটনা। এখন আমার এই দুঃখের মধ্যে অংশগ্রহণ করা উচিত এবং আমার যতটা সম্ভব জাতিকে দুঃখকষ্ট থেকে মুক্তি করার চেষ্টা করব"।

তিনি মুসলিম অধঃপতনের শিকড় চিহ্নিত করতে গিয়ে দেখেন এর পেছনে প্রধানত দু'টি মূল কারণ আছে- ১. ধর্মীয় কুসংস্কার, ২. ব্রিটিশ ও ভারতীয় মুসলিমদের মধ্যে প্রকৃত সহানুভূতিশীল অনুভূতির অভাব।

[4] . Shan Muhammad, *The Aligarh Movement,* Aligarh (Inida): Educational Book House, 1999, pp. 21-30.

[5] . Ibid, pp. 31-34.

[6] . মাওলানা ফজলে হক খয়রাবাদী,"*আযাদী আন্দোলন 1857*",অনুবাদ: মহীউদ্দীন খান, ঢাকা: মদিনা পাবলিকেশন, 1994,P. 15.

সৈয়দ ঘোষণা করেন এর চিকিৎসা দ্বারা ভারতের আর্থ-সামাজিক রোগগুলি নিরাময় করা যেতে পারে শিক্ষার মাধ্যমে। মুসলমানদের শিক্ষাগত উদ্যোগ কেমন হওয়া যায় যাতে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে তাদের পুনরুজ্জীবন ঘটে এবং ঐক্যবদ্ধ ভারতীয় সমাজে একটি আত্মসম্ভ্রমবোধ সম্পন্ন মানবগোষ্ঠী হিসেবে তার আত্মপ্রকাশ করতে পারে।

ড. আল্লামা ইকবাল বলেছেন, "মানুষের প্রকৃত মহিমা (স্যার সৈয়দ) এই সত্যের মধ্যে রয়েছে যে, তিনি প্রথম ভারতীয় মুসলমান যিনি ইসলামের নতুন অভিমুখের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন এবং এর জন্য কাজ করেছিলেন।"

আধুনিক মুসলিম সম্প্রদায় গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন যা বৈজ্ঞানিক শিক্ষার মাধ্যমে সত্য ইসলাম সন্ধান করতে বুঝতে এবং প্রদর্শন করতে পারে। তিনি ১৮৬৩ সালে মুসলমানদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক মেজাজ তৈরির জন্য এবং পশ্চিমীজ্ঞান তাদের নিজস্ব ভাষায় ভারতীয়দের উপলব্ধি করার জন্য 'বৈজ্ঞানিক সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৮৬৬ সালের মার্চ মাসে বৈজ্ঞানিক সমাজের একটি সংগঠন আলীগড় ইনস্টিটিউট গেজেট শুরু হয় এবং ঐতিহ্যগত মুসলিম সমাজের মন পরিবর্তন করতে সফল হয়। দৃঢ় প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হওয়া যেকোন ও ব্যক্তি শক্তিশালী শক্তির মুখোমুখি হতে পারে। কিন্তু স্যার সৈয়দ আরেকটি পত্রিকা 'তেহজিবুল আখালক' প্রকাশ করে উত্তর দেন যেটি সঠিকভাবে ইংরেজিতে 'মোহামেডান সোশ্যাল রিফর্মার' হিসাবে নামকরণ করা হয়েছিল।

১৮৬৯ সালে তিনি লন্ডনে সফর করেন।তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে একটি কলেজ তৈরি করা। কিন্তু তার সাথে আপোষ না করা ইসলামী মূল্যবোধ তিনি চেয়েছিলেন এই কলেজটি পুরাতন ও নতুন, পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে একটি সেতু হিসাবে কাজ করবে। পশ্চিমা শিক্ষার উপর ভিত্তি করে নির্দেশনা প্রদানের প্রয়োজনীয়তা ও তাৎক্ষণিকতা তিনি সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করেছিলেন, অথচ তিনি প্রাচ্য শিক্ষার মূল্যের অবহেলা করেন নি এবং অতীতের পুরাতন সমৃদ্ধ উত্তরাধিকারকে সংরক্ষণ ও প্রেরণ করতে চেয়েছিলেন।[7] স্যার সৈয়দ বলেন, "আজ আমরা যে বীজ বপন করি, সেখান থেকে একটি শক্তিশালী গাছ উঠতে পারে, যার শাখাগুলি মাটির বনভূমিগুলির মতই তাদের পৃথিবীতে দৃঢ় শেকড় সৃষ্টি করবে"।

কলেজ তৈরি করার স্বপ্ন অর্থ ছাড়া পূরণ হতে পারেনা। অর্থ সাহায্যের জন্য ভিক্ষুকের বেশে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন। চাওয়ার সময় কখনও তিনি ভাবতেন না কে আমি আর কার কাছে চাইছি? কলেজ তৈরি করতে যারা সাহায্য করেছিলেন, তাঁরা হলেন মৌলবী সমিউল্লাহ খান, সৈয়দ মাহমুদ, নবাব মহসিন উলমূলক, নবাব ভিকার উল মূলক, মাওলানা আলতাফ হোসেন হালি, রাজা জয় কিষান দাস, যাকা উল্লাহ খান, স্যার আগা খান, সাহেবজাদা আফতাব আহমেদ খান, ডক্টর স্যার জিয়াউদ্দিন, ডক্টর শেখ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ।

[7] . Ibid.

১৮৭৫ সালে, স্যার সৈয়দ Muhammadan Anglo Oriental College প্রতিষ্ঠা করেন এবং অক্সফোর্ড ও ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে। পরবর্তীতে ১৯২০ সালে আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির নামে পরিচিত হয়। ভারতের উত্তর প্রদেশ রাজ্যের আলীগড় জেলাতে অবস্থিত ৪৬৭.৬ হেক্টর জমির ওপর এর ক্যাম্পাস এবং এখানে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বর্তমানে ৩০০০০। ভারতের শীর্ষ দশটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির স্থান দ্বিতীয়। শিক্ষাগত ও আধুনিক উভয় শাখায় ৩০০ এর বেশি বিষয়ে পড়ানো হয়, এর পাশাপাশি মাল পুরুম (কেরালা), মুর্শিদাবাদ (পশ্চিমবঙ্গ) এবং কিশানগঞ্জ (বিহার) এ আলীগড়ের ক্যাম্পাস খোলা হয়েছে।

৩.১. ক্যাম্পাস গুলির অবস্থান

আলীগড়: আলীগড় গঙ্গা এবং যমুনা নদী সংযোগ স্থলে ১৩০ কিঃ মিঃ দক্ষিণ-পূর্বে দিল্লি-হাওড়া রুট এবং গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডে অবস্থিত। আলীগড়-এর ক্যাম্পাস রেলওয়ে স্টেশন থেকে মাত্র ২ কিঃ মিঃ দূরে অবস্থিত।

মালাপ্পুরম: কেরালা এর মালাপ্পুরম 'a land on top hills' নামে পরিচিত। ক্যাম্পাসের পূর্বে নীলগিরি পর্বত এবং পশ্চিমে আরব সাগর অবস্থিত।

মুর্শিদাবাদ: পশ্চিম বঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার নাম নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর নাম অনুসারে যিনি বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার স্বাধীন নবাব ছিলেন। আলীগড়-এর ক্যাম্পাস গঙ্গা নদীর দক্ষিণে অবস্থিত।

কিশানগঞ্জ: কিশানগঞ্জ প্রাথমিকভাবে নেপালগড় নামে পরিচিত ছিল। মুগল আমলে এটির নাম আলমগঞ্জে রূপান্তরিত হয়, পরবর্তীতে এটি কিশানগঞ্জ নামে পরিচিত।

৪. আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি

আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচীনতম এবং সব থেকে বিখ্যাত এক আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এখানে পড়াশোনা করতে এসে থাকে। পাশাপাশি থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সৌদি আরব, ইরান, আফ্রিকা ও ইউরোপ মহাদেশ থেকেও ছাত্র-ছাত্রী এখানে আসে।[8]

কিছু কোর্সে SAARC এবং Commonwealth দেশগুলির শিক্ষার্থীদের জন্য আসন সংরক্ষিত করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২টি ফ্যাকাল্টি রয়েছে-Agricultural Sciences,Arts, Commerce, Engineering & Technology, Law, Life Sciences, Medicine, Management Studies & Research,

[8] . Aligarh Muslim University (2017), Annual Report 2016-17, General Section, Registrar's office, A.M.U., Aligarh p. 2.

Science, Social Sciences, Theology, Unani Medicine, International Studies, each comprising of several Departments of Studies.

বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকটি Colleges, Institutes, Centres and Schools রয়েছে। সেগুলি হ'ল– Women's College, Centre of Professional Courses, Interdisciplinary Biotechnology Unit, Zakir Hussain College of Engineering & Technology, Ajmal Khan Tibbiya College, Jawaharlal Nehru Medical College, Dr. Ziauddin Ahmad Dental College, Institute of Ophthalmology, Centre for Advanced Studies in History, Centre for Women Studies, Centre for Nehru Studies, University Polytechnic, Women's Polytechnic, K.A. Nizami Centre for Quranic Studies, Community College, Centre for Promotion of Educational and Cultural Advancement of Muslims of India (CPECAMI), Department of Foreign Languages, Schools including one for the visually challenged.[9]

আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি সাংগঠনিক কাঠামো **(Organizational Structure):**

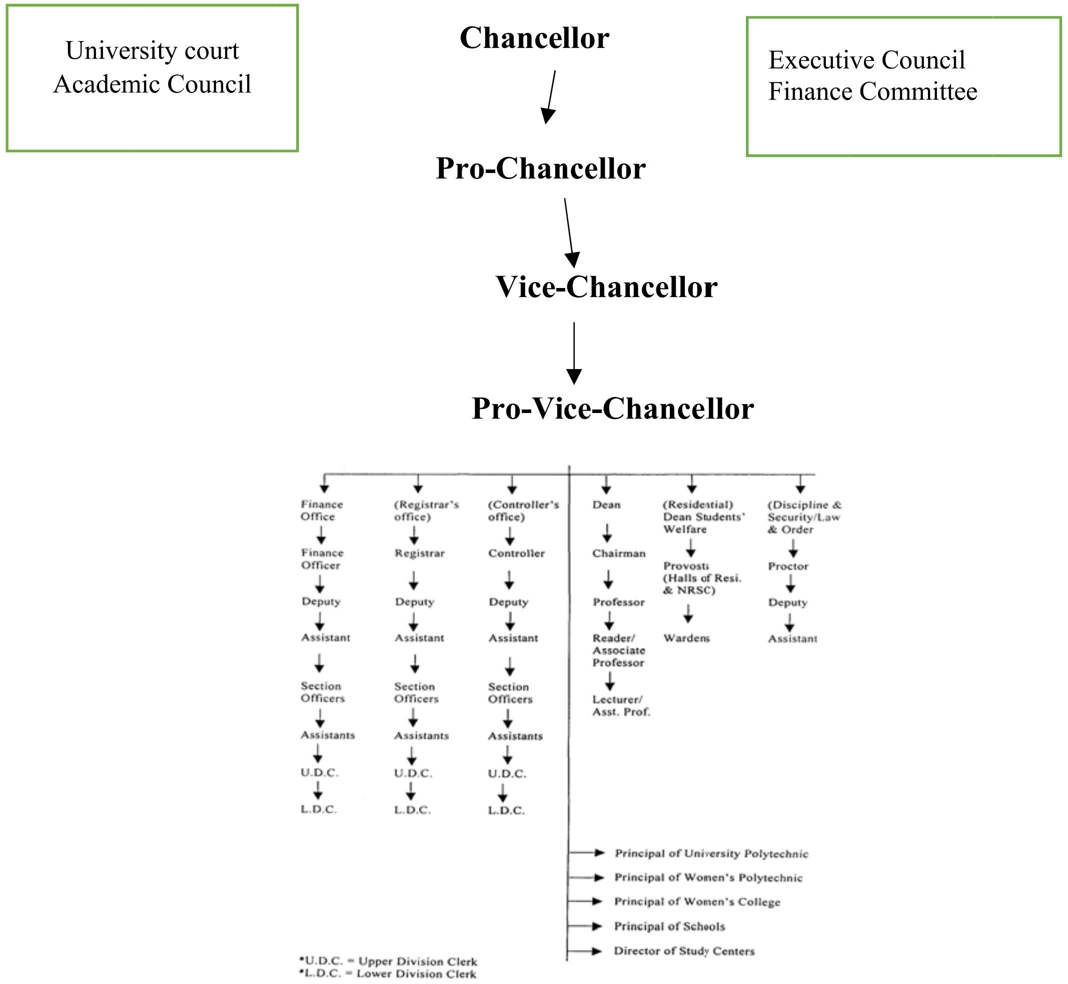

[9]. Anil Maheshwari, *Aligarh Muslim University: Perfect Past and Precarious Present,* New Delhi: UBS Publishers' Distributors, 2001, pp.330-331.

৪.১. বিশ্ববিদ্যালয়-এর গ্রন্থাগার

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারটি বিশ্বের বৃহত্তম গ্রন্থাগার গুলির মধ্যে একটি। এটি ভারতের প্রথম এবং এশিয়ার মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম লাইব্রেরি যা মওলানা আজাদ লাইব্রেরি হিসেবে পরিচিত। এটি ৪.৭৫ একর জমির উপর অবস্থিত। সসেখানে প্রায় ১৮০০০০০ বই এবং ৫৫০৯৭ বর্তমানে জার্নাল রয়েছে।[10]

১৮৭৭ সালে লাইব্রেরির ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল। ভারতের তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড লিটনের মোহামেডান অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠার সময় এবং তার নামে লিটন গ্রন্থাগারের নামকরণ করা হয়েছিল। বর্তমান গ্র্যান্ড সাত তলা ভবনটি উদ্বোধন করেন। ১৯৬০ সালে স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু এবং গ্রন্থাগারটির নামকরণ করেন “মওলানা আজাদ গ্রন্থাগার” নামে। মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, একজন মহান পণ্ডিত, শিক্ষাবিদ, রাজনীতিক, মুক্তিযোদ্ধা এবং প্রথম শিক্ষামন্ত্রী স্বাধীন ভারত।

গ্রন্থাগারটি উর্দু, ফারসি ও আরবি ভাষার বিরল পাণ্ডুলিপি এবং বইগুলির একটি বিশ্বখ্যাত সংগ্রহ স্থল। গ্রন্থাগারের সবচেয়ে মূল্যবান অংশ গুলির মধ্যে একটি হল তার পাণ্ডুলিপি বিভাগ, ইসলাম, হিন্দুধর্ম, ইত্যাদির প্রায় ১৬০০০ বিরল এবং মূল্যবান পাণ্ডুলিপি রয়েছে, যার মধ্যে চতুর্থ খলিফা হযরত আলী রা.এর হাতে লেখা কুরআনও রয়েছে এই লাইব্রেরীতে।

৫. অবদান

দেশের মানুষ যখন অন্ধকারে, ডুবে তখন স্যার সৈয়দ Aliagrh Muslim University প্রতিষ্ঠা করে অন্ধকারকে দূর করেন। ভারতের ইতিহাসে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান-এর উল্লেখযোগ্য কিছু নিম্নে তুলে ধরা হলো[11]–

৫.১. ধর্মীয় ক্ষেত্রে অবদান

ফাকাল্টি অফ থেওলজি:

আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির এটি একটি প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান। স্যার সৈয়দ আহমদ খান,শিয়া ও সুন্নির ধর্মীয় শিক্ষার সূচনা করেন। তিনি শিয়া ও সুন্নি সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট আলেমদের এখানে আমন্ত্রণ করেন। দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা কাসিম নাভতির জামাতা মাওলানা আব্দুল্লাহ আনসারী প্রথম এখানে নাজিমে-এ-দ্বীনিয়াত পদে নিযুক্ত হন। এটি ভারতের একমাত্র প্রতিষ্ঠান যেখানে এক সাথে শিয়া ও সুন্নি ধর্মশাস্ত্রের শিক্ষাদান

[10]. Sarbjit Singh Pawar, *University Grants Commission (UGC) and Development of Libraries,* New Delhi: Deep and Deep Publications, 1998, pp. 111-112.

[11]. Anil Maheshwari, op.cit. pp-1-14.

করা হয়। যার মাধ্যমে ক্যাম্পাসের মধ্যে একটি ধর্মীয় সামঞ্জস্য দেখা যায়। এই ফ্যাকাল্টির শিয়া-সুন্নি ঐক্যের প্রতীক যেটা স্যার সৈয়দ এর মুসলিম ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের দৃষ্টিভঙ্গিকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

এখান থেকে বহু বিখ্যাত ধর্মীয় পণ্ডিতদের জন্ম হয়। তারা হলেন- মওলানা আবদুল লতিফ রহমানী, মাওলানা সুলাইমান আশরাফ, প্রফেসর সাঈদ আহমদ আকবরাবাদী, আল্লামা আলী নকভি, মুফতি হাফিজুল্লাহ, প্রফেসর তাকি আমিনী, আল্লামা মুজতবা হাসান কামুনপুরী, অধ্যাপক ফজলুর রহমান গিনিরি এবং অধ্যাপক মাওলানা কালবে আবিদ।

ইসলামিক স্টাডিজ

১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। যেমন, ১. ইসলামী সংস্কৃতি ও সভ্যতা, ২. পশ্চিম এশিয়ায় এবং উত্তর আফ্রিকার দেশগুলির সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রবণতা এবং ৩. আধুনিক আরবি, ফার্সি, তুর্কি (ভাষা ও সাহিত্য) অধ্যয়নকে উৎসাহিত করার জন্য ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ডিপার্টমেন্ট প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য গুলি হ'ল- ১. সমসাময়িক মুসলিম বিশ্বের সমস্যা ও তার প্রতিকার, ২. কিভাবে মুসলিম বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ করা যায় সেলক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের সেমিনার এবং কনফারেন্স, ৩. ইসলামে যে একটা সুন্দর প্রতিচ্ছবি আছে সেটা বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরা।

এই বিভাগের বিখ্যাত ইসলামিক পণ্ডিতরা হলেন-প্রফেসর কবির আহমেদ, প্রফেসর এম সলিম কিদওয়াই, প্রফেসর আব্দুল আলী, প্রফেসর এম ইয়াসিন মাজহার সিদ্দিকী, প্রফেসর মোহাম্মদ ইসমাইল, প্রফেসর ইমতিয়াজ ইউসুফ।

কে. এ .নিজামী সেন্টার ফর কুরআনিক স্টাডিজ:

কে. এ. নিজামি সেন্টার কুরআন অধ্যয়নের কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। একাডেমিক কাউন্সিল এবং নির্বাহী কাউন্সিলের অনুমোদনের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটর হিসাবে ভারতের রাষ্ট্রপতি ১৯৯৮ সালে এ এম ই আইন (১৯৮১) এর বিধান অনুসারে তার প্রতিষ্ঠাকে অনুমোদন করেন।

শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনা ক্ষেত্রে একাডেমিক শ্রেষ্ঠত্বের অগ্রগতির জন্য কেন্দ্রটি অঙ্গীকারাবদ্ধ। এর লক্ষ্য ইসলামী সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে রক্ষা করা। এটি ইসলামী বিশ্ব ও পশ্চিমা বিশ্বের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করার চেষ্টা করে। এবং এটি ইসলামী শিক্ষা, ধর্মীয় শিক্ষা ও ভারতীয় মুসলমানদের শিক্ষাগত অগ্রগতি প্রচারের লক্ষ্যে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের মিশন-এর অবদান রাখে।

৫.২.বিজ্ঞান ক্ষেত্রে অবদান

ফ্যাকাল্টি অফ সাইন্স:

২৭ মার্চ ১৯৪৪ সালে ফ্যাকাল্টি অফ সাইন্স প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এতে রসায়ন বিভাগ, ভূগোল, ভূতত্ত্ব, গণিত, পদার্থবিজ্ঞান, বোটানি এবং প্রাণিবিদ্যা বিভাগ গঠিত হয়। মে ১৯৮৬ সালে, লাইফ সায়েন্সেস (বোটানি এবং প্রাণিবিদ্যা বিভাগসহ) তৈরি করা হয়েছিল। বর্তমানে বিজ্ঞান অনুষদের সাতটি বিভাগ রয়েছে- ১. রসায়ন বিভাগ, ২. কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগ,৩. ভূগোল বিভাগ, ৪. ভূ-বিদ্যা বিভাগ,৫. গণিত বিভাগ,৬. পদার্থবিদ্যা বিভাগ, ৭. পরিসংখ্যান ও অপারেশন গবেষণা বিভাগ।

বৈজ্ঞানিকদের নাম:

- মনসুর হোদা, সায়েন্টিস্ট ইন টি এরিয়া অফ অপপ্রোপ্রিয়েতে টেকনোলজিইন ইন্ডিয়া
- শহীদ জামিল, বিরোলজিস্ট, শান্তি স্বরূপ ভাটনাগরলাউড়েআট
- কাজী মোবিন-উদ্দিন, ইনভেন্টর অফ টি ইন ফেরিওরভেনাকাভাফিল্টার
- সায়েদ জিয়াউর রহমান, ফার্মাকোলজিস্ট
- জরমি দুষ্ট সাফাভি, মাস্টার অফপার্সিং লিটারেচার, এস্টাব্লিশড পারসিয়ান ল্যাংগুয়েজে রিসার্চ সেন্টার অফ দি আলিগড় ইউনিভার্সি
- হাসান নাসি এম সিদ্দিকীই, মেরিন গেওলোজিস্ট, পদ্মা শ্রী রেসিপিয়েন্ট এন্ড শান্তি স্বরূপ ভাটনাগর লাউড়েআট।

৫.৩. চিকিৎসা ক্ষেত্রে অবদান

জওহরলাল নেহেরু মেডিকেল কলেজ:

২০১৬ সালের এক জরিপে দেখা যায়, জওহরলাল নেহেরু মেডিকেল কলেজ ভারতের মেডিকেল কলেজগুলির মধ্যে ১২তম স্থান অধিকার করে। ১৯৬২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় কলেজটি আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির অংশ হিসেবে। প্রশিক্ষণের মধ্যে দিয়ে এখানকার ছাত্র-ছাত্রীরা রোগীদের সেবাযত্ন করে খ্যাতি লাভ করে।

কলেজটিতে ১৫০ MBBS এবং ১৪৬ জন স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থী রয়েছে এবং প্রায় সকল বিশেষত্ব এবং নার্সিং ও প্যারামেডিকেল কোর্সে ডিপ্লোমা হিসাবে স্নাতকোত্তর এবং স্নাতকোত্তর প্রোগ্রামগুলি সফলভাবে চলছে। জওহরলাল নেহরু মেডিকেল কলেজে ২৫টি বিভাগ এবং ৩টি কেন্দ্র রয়েছে। কলেজটি দেশের প্রাচীনতম 'ইনস্টিটিউট অফ ওফথলমোলজি'। কলেজের বিভিন্ন বিভাগে তাদের মূর্তি নিয়ন্ত্রক সংস্থার যথাযথ শিক্ষণ অনুষদ রয়েছে। অনুষদের ২৪০ যোগ্য এবং অভিজ্ঞ শিক্ষক রয়েছে। জওহর লাল নেহেরু মেডিকেল কলেজটি দীর্ঘ পথ ধরে এসেছে,

এটির অনন্য চরিত্র বজায় রেখেছে। এখনও সময়ের সাথে এগিয়ে যাচ্ছে এবং সমস্ত কার্যক্রমের ক্ষেত্রে গতিশীলভাবে করছে।

আজমল খান তিব্বিয়া কলেজ:

আজমল খান তিব্বিয়া কলেজ ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইউনানী ঔষধ সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠানটি খ্যাতি লাভ করে। এখানে প্রাকৃতিক, নিরাপদ, সাশ্রয়ী মূল্যের এবং সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা পদ্ধতি দেয়া হয়।

৫.৪. প্রকৌশলী ও প্রযুক্তি

জাকির হোসেন কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি:

'জাকির হোসেন কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি' সর্বদা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, বৈজ্ঞানিক শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা এবং জাতীয় আন্তর্জাতিকমানের গবেষণা দ্বারা এটি দেশে বিদেশে খ্যাতি লাভ করে।

কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৩৫ সালে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের একক কলেজ হিসেবে। কলেজটিতে ১১৩ একর জমি এবং ২২৬০ মি। কলেজের শ্রেষ্ঠত্ব দেশের ৪০০টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সনাক্ত করা হয়েছিল এবং আই আই টি স্তর পর্যায়ে আপগ্রেড করার জন্য সাতটি নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের তালিকায় রাখা হয়েছিল। "ইন্ডিয়া বেস্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ২০১৫-এর মধ্যে এটি ইন্ডিয়া টুডে দ্বারা ২১তম স্থান পেয়েছে।

৫.৫. সমাজবিজ্ঞান

ফ্যাকাল্টি অফ সোশল সাইন্স:

১৯৬৯ সালে 'ফ্যাকাল্টি অফ সোশ্যাল সাইন্স' প্রতিষ্ঠিত হয়। যার সাথে সংযুক্ত- অর্থনীতি, শিক্ষা, ইতিহাস, রাজনৈতিক বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, ইসলামিক স্টাডিজ, পশ্চিম এশিয়ান গবেষণা, গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান বিভাগ, সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগ বিভাগ, শারীরিক স্বাস্থ্য ও ক্রীড়াশিক্ষা, দক্ষিণ আফ্রিকার ও ব্রাজিলিয়ান স্টাডিজের মহিলা গবেষণা ও কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বর্তমানে চৌদ্দটি বিভাগ/কেন্দ্র ও উন্নয়ন গবেষণা কেন্দ্রের জন্য ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের সাথে যুক্ত। মানবসম্পদ বিভাগ এবং জনসংখ্যা বিভাগ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব ইউজিসিকে পাঠানো হয়েছে।

'ফ্যাকাল্টি অফ সোশাল সাইন্স' এর অধীনে অনেক বিভাগ শিক্ষক ও গবেষণার মধ্য দিয়ে নিজেদের জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক মহলে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। ১৯৬৮ সাল থেকে ইতিহাস বিভাগ উন্নত গবেষণা ও গবেষণার কেন্দ্র বজায় রেখেছে। ইউনিসেফ কর্তৃক সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকল্যাণ বিভাগের অনুদান প্রদান করা হয়। উল্লেখযোগ্য শিক্ষার্থী- জামাল খওয়া, ফর্মার ডিন অফ আর্টস ফ্যাকাল্টি, আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি এবং মেম্বার অফ পার্লামেন্ট।

৫.৬. সাইবার লাইব্রেরি

'ফ্যাকাল্টি অফ সোশাল সাইন্স' অধীন সাইবার লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করা হয়। সাইবার লাইব্রেরি জাতীয় রেকর্ড স্থাপন করেছে দৈনিক ওয়েব ভিত্তিক, ই-বুকস, ই-জার্নাল, ইন-হাউস লেকচার, বিশিষ্ট পণ্ডিতদের ভিডিও বক্তৃতা, তথ্যকেন্দ্র এবং সামাজিক বিজ্ঞান সম্পর্কিত সফ্টওয়্যারের আকারে উপলব্ধ ই-সম্পদ। সম্প্রতি সামাজিক বিজ্ঞান সাইবার লাইব্রেরীতে জাতীয় রেকর্ডের একটি প্রশংসাপত্র জারি করেছে। সাইবারি ব্যবহারকারীর বন্ধুত্বপূর্ণ ইন্টারফেসের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী সামাজিক বিজ্ঞানীদের প্রবেশাধিকার প্রদান করে এবং বর্তমানে এখন পর্যন্ত গবেষণা এবং বৃত্তির জন্য ১৫০ দেশে অ্যাক্সেস করা হচ্ছে।

৫.৭.বিভিন্ন ভাষার ক্ষেত্রে অবদান

ফ্যাকাল্টি অফ আর্টস

ফ্যাকাল্টি অফ আর্টস ১০টি বিভাগ নিয়ে গঠিত। এইসব বিভাগ গুলিতে বিভিন্ন ভাষার শিক্ষা দেয়া হয়। যেমন-আরবি, ইংরেজি, ফাইন আর্টস, হিন্দি, ভাষাতত্ব, আধুনিক ভারতীয় ভাষা(তেলেগু, তামিল, মালয়ালাম, বাংলা, মারাঠি, পাঞ্জাবী ও কাশ্মিরি), ফার্সি, দর্শনশাস্ত্র, সংস্কৃত ও উর্দু। এছাড়াও অর্থনীতি, আইন শাস্ত্র, কৃষিবিজ্ঞান, ইত্যাদি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। এখানকার কিছু ছাত্র-ছাত্রী যারা মুসলিম সমাজের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ধর্মীয় সকল ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখেছেন তারা হলেন-

স্বাধীনতা সংগ্রামী:

- আব্দুল গফফার খান,হাসরাত মোহানী,মাওলানা শওকত আলী, মাওলানা মোহাম্মদ আলী, সৈয়দ মীর কাসিম।

রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান:

- আমিন হিল মিদিদি (মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতি)
- লিয়াকত আলী খান (পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী)
- মনসুর আলী (বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী)

- মোহাম্মদ হামিদুল্লাহ খান (ভোপাল রাজকীয় রাজ্য শাসক)
- ডাক্তার জাকির হোসেন (ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি)

ফার্স্ট লেডি অব দ্যা কান্ট্রি:

- মিসেস আবিদা আহমদ (ভারতের রাষ্ট্রপতি ফখরুদ্দিন আলী আহমেদ এর স্ত্রী)

সুপ্রিমকোর্টের বিচারক:

- বিচারপতি বাহারুল ইসলাম
- বিচারপতি সৈয়দ মুর্তজা ফজলে আলী প্রমূখ।

হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি:

- বিচারপতি বাহাউদ্দিন ফারুকী
- বিচারপতি গোলাম পানজাতান
- জনাব হামিদুল্লাহ খান প্রমূখ।

ভারতের বাইরে প্রধান বিচারপতিগণ:

- আবদুল হাকেম খান,পাকিস্তান
- বিচারপতি অগাস্টিন সাঈদী,উগান্ডা
- বিচারপতি বেজর আহমেদ খান, তাঞ্জানিয়া
- বিচারপতি রুহুল ইসলাম,বাংলাদেশ,প্রমূখ।

ভারতের বাইরে অ্যাটর্নি জেনারেলস এবং অ্যাডভোকেট জেনারেলস:

- জনাব আলী আহমদ ফুজাইল,পাকিস্তান
- এস. নাসিরউদ্দিন,পাকিস্তান,প্রমূখ

ভাইস-চ্যান্সেলর:

- ড. এ.এ.আব্বাসি, ইন্দোর বিশ্ববিদ্যালয়
- আব্দুল আলেম প্রফেসর, আলীগড় মুসলিম বিশ্ব বিদ্যালয়
- সাহেবজাদা আফতাব আহমদ খান, আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়
- প্রফেসর মুশিরুল হাসান, জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া, দিল্লী
- প্রফেসর নবি বুক্স বেলুচ,আল্লামা ইকবাল ওপেন ইউনিভার্সিটি, ইসলামাবাদ প্রমূখ।

৭. উপসংহার

অনেক চেষ্টা অনেক কষ্টের পর অবশেষে তৈরি হলো সেই স্বপ্নের সেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। তিনি বলেন,

...আমি আমার জীবন সমস্ত সত্বা দিয়ে জাতির ভালো চিন্তা করলাম। কোন সকাল কোন সন্ধ্যা এমন যায়নি যখন আমি আমার নিজ জাতির কথা ভাবিনি। আজ যখন কলেজের ইমারতের দিকে তাকায় মনটা প্রসন্নতায় ভরে ওঠে"। স্যার সৈয়দ এর অবদান ভারতের মুসলিমরা কখনো ভুলবে না। তিনি যদি বিশ্ববিদ্যালয় কায়েম না করতেন, তবে আজ ভারতীয় মুসলিমরা ১০০ বছর পেছনে অবস্থান করতো।তারই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ভারতে মুসলিমরা মাথা উঁচু করে বাঁচতে শিখেছে। যখন ভারতীয় মুসলিমদের বাবরি মসজিদ, গো-হত্যা, 'লাভ জিহাদ' নামে বর্বরভাবে হত্যা করা হয়। তখন সর্বপ্রথম প্রতিবাদের আওয়াজ আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি থেকে শোনা যায়। আজ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্র-ছাত্রীরা শুধু ভারত বর্ষে নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে উচ্চ স্তরে পৌছে, স্যার সৈয়দ এর নামকে অমর করে রেখেছে। তিনি ২৭ মার্চ ১৮৯৮ পৃথিবী থেকে চির বিদায় নিলেন। ক্যাম্পাসের জুমা মসজিদের ভেতরে তিনি শায়িত আছেন।

তিনি ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আরো নসিহত করে গিয়েছিলেন- "যখন তুমি একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে পৌঁছে যাবে মনে রাখবে, যখন আমি কাজটি শুরু করেছিলাম তখন আমার বিরুদ্ধে সবাই সমালোচনা করেছিল। আমার জীবনটা এত কঠিন হয়ে উঠেছিল যে, আমার বয়সের আগে আমি বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। আমার চুল ও আমার চোখ হারিয়ে ফেলেছিলাম। কিন্তু আমার লক্ষ্য নয়। আমার লক্ষ্য কখনো নষ্ট হয়নি, আমার দৃঢ় সংকল্প কখনো ব্যর্থ হয়নি, আমি তোমাদের জন্য প্রতিষ্ঠানটি তৈরি করেছি এবং আমি নিশ্চিত তোমরা এই প্রতিষ্ঠান আলোকে বহুদূর এগিয়ে যাবে এবং অন্ধকারকে দূর করবে।"

গ্রন্থপঞ্জি

1. Ansari Asloob Ahmad, "Sir Syed Ahmad Khan: A Centenary Tribute", Delhi: Adam Publishers, 2001.
2. Muhammad Shan, *The Aligarh Movement,* Aligarh (Inida): Educational Book House, 1999.
3. Hasan Tariq, *The Aligarh Movement and the Making of the Indian Muslim Mind (1857-2002),* Inida: Rupa & Co., 2006.
4. কাজী নজরুল ইসলাম, সঞ্চিতা।
5. মাওলানা ফজলে হক খয়রাবাদী,"*আযাদী আন্দোলন 1857*",অনুবাদ: মহীউদ্দীন খান, ঢাকা: মদিনা পাবলিকেশন, 1994
6. Aligarh Muslim Univeristy Gazette, vol.53, October, 2016.